জিএম বায়োসন্ত্রাসের শিকার বাংলাদেশ : হুমকির মুখে দেশের কৃষি এবং খাদ্য নিরাপত্তা

যোবায়ের আল মাহমুদ

বীজ নিয়ে বহুজাতিক কোম্পানির যে রাজনীতি তার নিষ্করুণ শিকার বাংলাদেশের কৃষি ও প্রাণবৈচিত্র্য! বিটি (ব্যাসিলাস থুরিনজেনসিস) বেগুন চাষের অনুমোদন দেয়ার পর এবার জেনেটিক্যালি মডিফায়েড (জিএম) আলুর মাঠ পর্যায়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা (ফিল্ড ট্রায়াল) চলছে বাংলাদেশে, লক্ষ্য জিএম আলুর চাষ শুরু করা। জিএম টমেটো, জিএম তুলা আনার প্রক্রিয়া চলছে। অর্থাৎ বাংলাদেশ এখন বহুজাতিক এগ্রো কর্পোরেশনের জিএম বাণিজ্যের উর্বর ভূমিতে পরিণত হচ্ছে।

জিএম প্রযুক্তি নিয়ে দুনিয়াজুড়েই বিজ্ঞানীরা দুই ভাগে বিভক্ত। এক পক্ষ দাবি করছে জিএম শস্য মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর, আরেক পক্ষ বলছে ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। এ স্বাস্থ্যঝুঁকির বিতর্ক বাদ দিলেও জেনেটিক্যালি মডিফায়েড অর্গানিজম (জিএমও)-এর সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে বীজের মালিকানা, খাদ্য নিরাপত্তা, পেটেন্ট আগ্রাসন তথা বায়োপাইরেসির প্রশ্ন। অর্থাৎ এগ্রি-বিজনেস (অদরকারি)। এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে হাজার হাজার বছরের কৃষকের নিজস্ব সম্পদ 'নন-জিএম' বীজের অবলুপ্তির আশঙ্কা।

কৃষিতে জিএম মানে শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নয়। জিএম যখন বহুজাতিক এগ্রো-কর্পোরেশনগুলোর ব্যবসার হাতিয়ার, তখন এর সঙ্গে বীজের রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রশ্নটিও জড়িত। জিএম নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা হতেই পারে, কিন্তু একে খাদ্যশস্য হিসেবে প্রয়োগের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা জরুরি। মানবদেহ, পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্যের ওপর জিএমের প্রভাব সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়েই জিএম বীজের বাণিজ্যিক ব্যবহার যেমন বিপজ্জনক, তেমনি জিএম বীজের প্রসারের মাধ্যমে কৃষিতে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর নিয়ন্ত্রণ ও একচেটিয়া কর্তৃত্ব কায়েম কৃষকের স্বার্থপরিপন্থী।

গত দুই দশক ধরেই বহুজাতিক কোম্পানিগুলো তৃতীয় বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী লোকায়ত জ্ঞান, প্রাণবৈচিত্র্য তথা জেনেটিক সম্পদকে অবৈধভাবে পেটেন্ট করে নিয়ে এসব সম্পদের ওপর তাদের নিরঙ্কুশ মালিকানা প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে।

জীববৈচিত্র্যের পণ্যকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী সম্পদ লুণ্ঠনের পথ প্রশস্ত করাই এসব বহুজাতিকের লক্ষ্য। ফলে বাংলাদেশের কৃষিতে জিএম বীজের বাণিজ্যিক ব্যবহারের যে প্রচেষ্টা এখন চলছে, এতে এদেশের কৃষি এবং খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে। বাংলাদেশের কৃষক বীজ মালিকানা হারালে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে এবং খাদ্য সার্বভৌমত্ব চলে যাবে বহুজাতিক কোম্পানির হাতে। জিএম বীজের মাধ্যমে কৃষিপ্রধান দেশের খাদ্য নিরাপত্তার উপর এই আগ্রাসনকেই বায়োপাইরেসি/বায়োসন্ত্রাস বলা হচ্ছে, যা মূলত এক ধরনের বায়োকলোনিয়ালিজম বা প্রাণ-উপনিবেশীকরণ।

বাংলাদেশের কৃষক বীজ মালিকানা হারালে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে এবং খাদ্য সার্বভৌমত্ব চলে যাবে বহুজাতিক কোম্পানির হাতে। জিএম বীজের মাধ্যমে কৃষিপ্রধান দেশের খাদ্য নিরাপত্তার উপর এই আগ্রাসনকেই বায়োপাইরেসি/বায়োসন্ত্রাস বলা হচ্ছে, যা মূলত এক ধরনের বায়োকলোনিয়ালিজম বা প্রাণ-উপনিবেশীকরণ।

এই 'প্রাণ-উপনিবেশীকরণ' নিয়ে দুই-একটি কথা বলেই আমরা মূল আলোচনায় ফিরব। উপনিবেশীকরণ বলতে দেশ/ভূমি দখলের যে প্রচলিত ধারণা তার পরিবর্তে 'প্রাণ-উপনিবেশীকরণের' ক্ষেত্রে আমরা দেখি বহুজাতিক কোম্পানির আগ্রাসনের মাধ্যমে দুর্বল দেশগুলোর প্রাণবৈচিত্র্য, উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব, শস্যবীজ এবং জিনের বেদখল হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ প্রযুক্তিতে উন্নত দেশগুলো কর্তৃক জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ দুর্বল দেশগুলোর হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী জেনেটিক সম্পদ ও লোকায়ত জ্ঞানকাঠামোর উপর এই আগ্রাসনকেই বায়োকলোনিয়ালিজম বলা হচ্ছে।

বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো কৃষিজ ও বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানকাঠামোকে কুক্ষিগত করার তাগিদে তথা উদ্ভিদ, প্রাণী, বীজ, জিন ও হারবাল মেডিসিনের মেধাস্বত্ব আদায়ের লক্ষ্যে বৃহৎ বিনিয়োগ করে আসছে। কিন্তু এই তৎপরতায় শুধু কোম্পানিই লাভবান হয়, অনুন্নত দেশের লোকায়ত জনপদ এসব জেনেটিক/প্রাকৃতিক সম্পদের মূল মালিক হলেও তাদের স্বার্থকে নির্মমভাবে জলাঞ্জলি দেয়া হয়।

বৈশ্বিক পুঁজিবাদের শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান (যেমন–বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা) এবং বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো এখন সাবঅলটার্নদের ব্যাপারে বিশেষভাবে আগ্রহী, কেননা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, তাদের ঐতিহ্যবাহী কালচার, জেনেটিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য (Lives and Bodies of rural and indigenous populations) এই প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে বাণিজ্য ও মুনাফার নতুন ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

বাণিজ্য সম্পর্কিত মেধাস্বত্ব চুক্তি কিভাবে বায়োপাইরেসি এবং মানুষের জেনেটিক সম্পদ শোষণের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে পশ্চিমের নয়া ঔপনিবেশিক শোষণকে জারি রাখে সে বিষয়ে গায়ত্রী স্পিভাক বলেন, "বর্তমানে সাবঅলটার্ন সম্পর্কিত ধারণা নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। নিম্নবর্ণের লোকজন এখন আর কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তথাকথিত কেন্দ্র (হেজিমনিক উন্নত দেশগুলো) এখন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য সম্পর্কিত মেধাস্বত্বের উৎস হিসেবে গ্রামীণ ও লোকায়ত সাবঅলটার্নদের বিবেচনা করছে"।[১] গায়ত্রী মূলত এই উক্তির মাধ্যমে উপনিবেশীকরণের নতুন রূপের দিকে ইঙ্গিত করেন, যার মাধ্যমে প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বায়োলজিকে উপনিবেশে পরিণত করা হয়। ফলে জীবসত্তাও এখন হয়ে ওঠে দখলের নতুন জমিন, প্রাণ ও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার পেটেন্ট বা মালিকানা দাবি করে বৈশ্বিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো কে কত লোকায়ত জ্ঞানকাঠামো ও বায়োলজিক্যাল সম্পদ নিজের মালিকানায় নিয়ে আসতে পারবে তার প্রতিযোগিতায়

লিপ্ত হচ্ছে তারা।

১৯৯০ সাল থেকেই ডব্লিউটিও অনুমোদিত গ্যাট (জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ) এবং গ্যাটস (জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস)-এর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষি খাতকে বৈশ্বিকভাবে উদারীকরণের দিকে নিয়ে যাওয়া এবং কৃষি সংস্কারের নামে রাষ্ট্রীয় সংরক্ষণবাদী বা 'প্রটেকশনিস্ট' বাধাসমূহ দূর করে উন্নয়নশীল দেশের কৃষিতে বৃহৎ কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য পাকাপোক্ত করা। অর্থাৎ কৃষিতে রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি হ্রাস করে দেশজ কৃষি উৎপাদনকে ব্যয়বহুল করে তোলা এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় বাধা দূর এসব দেশকে বহুজাতিক কর্পোরেশনের কৃষিজাত দ্রব্যের বাজারে পরিণত করা।

এছাড়াও ডব্লিউটিওর এগ্রিমেন্ট অন এগ্রিকালচারও (এওএ) কৃষিখাত উদারীকরণের নামে অনুন্নত দেশগুলোর কৃষি ব্যবস্থার উপর বহুজাতিক এগ্রো-কর্পোরেশনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার দরজা খুলে দিচ্ছে। যেমন–'এওএ'র আওতায় অনেক উন্নয়নশীল দেশ বহুজাতিক কোম্পানির হাইব্রিড এবং নন-হাইব্রিড জিএম (জেনেটিক্যালি মডিফায়েড) শস্য চাষ করতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে ঐতিহ্যবাহী দেশি জাতের জায়গা দখল করে নিচ্ছে বহুজাতিক কোম্পানির মালিকানাধীন জিএম শস্যজাত। বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো দাবি করছে যে, বায়োটেক জিএমও শস্যের চাষে কীটনাশকের ব্যবহার কমাবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূর করবে। তবে তাদের এই দাবির বিপরীতে বিষেশজ্ঞরা বলছেন যে, ডাব্লিউটিও এই আধিপত্যবাদী কাঠামোর মধ্যে জিএমও প্রযুক্তির ব্যবহার স্থানীয় কৃষকদের নিজস্ব উৎপাদনশীলতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, ক্ষুদ্র কৃষক ও খামারের ধ্বংস সাধন করবে, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করবে এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেবে। শুধু কৃষিতেই নয়, ডব্লিউটিওর বাণিজ্য সম্পর্কিত মেধাস্বত্ব অধিকার চুক্তির (TRIPS) ফলে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এখন প্রযুক্তিতে অনুন্নত দেশগুলোর ঐতিহ্যবাহী ঔষধি বৃক্ষের জাত বা হারবাল মেডিসিনেরও মেধাস্বত্ব বা পেটেন্ট করিয়ে নিচ্ছে। ফলে লোকায়ত জনগোষ্ঠী নিজস্ব ঔষধি জাতের গাছের উপর নিয়ন্ত্রণ/মালিকানা হারাচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য উৎপাদন সম্পর্ক এবং উৎপাদন কাঠামোর পুনর্গঠনের মাধ্যমে 'বৈশ্বিক বাণিজ্যিক খাদ্য সাম্রাজ্য' (Global corporate food regime) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গ্রিনফিল্ডের মতে, "ডব্লিউটিও একটা কর্পোরেট সাম্রাজ্যকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে, যা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা (Food Self Sufficiency) এবং খাদ্য নিরাপত্তার (Food Security) ধারণাকে কর্পোরেট বাণিজ্য ও মুনাফা অর্জনের পথে বাধা হিসেবে দেখে এবং যা এমন এক বৈশ্বিক ও দেশীয় আইন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করে, যেন বৈশ্বিক পুঁজিবাজারের প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণকে সুসংহত করা সম্ভবপর হয়। এসব বহুজাতিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রকে বৈশ্বিক পুঁজিবাজারের সাথেই সম্পৃক্ত করা হয়েছে এবং মূলত রাষ্ট্র নিজেই

বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রায় শতকরা ৬৫ ভাগ আসে কৃষি থেকে এবং মাত্র ১০টি বহুজাতিক 'এগ্রোকেমিক্যাল' প্রতিষ্ঠান বৈশ্বিক কৃষি ব্যবসার প্রায় ৮১ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়াও উল্লেখ্য, গোটা বিশ্বের সামগ্রিক বীজ বাজারের প্রায় ৬৪ শতাংশ দখল করে রেখেছে মাত্র ১০টি বহুজাতিক কোম্পানি।

কর্পোরেট বডি আকারে ভূমিকা পালন করছে"।[২]

কৃষি বিশেষজ্ঞ ম্যাক মাইকেলের মতে, "খাদ্য উৎপাদন ও ভোগে বৈচিত্র্যের বদলে মনোকালচার প্রবর্তন করে খাদ্য উৎপাদন ও ভোগ ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক পরিবর্তন, টার্মিনেটর জিন ব্যবহার করে বীজ মালিকানা কুক্ষিগত করার অপচেষ্টা এবং শ্রেণিভিত্তিক খাদ্যরুচির প্রমোশনের মাধ্যমে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো কৃষিতে জাতিগত ও কমিউনিটিকেন্দ্রিক উন্নয়ন ধারণাকে নাকচ করে দিয়ে নয়া উদারনৈতিক বিশ্ব ব্যবস্থার (Global neo-liberal order) প্রবর্তন করে। ফলে লোকাল খাদ্য নিরাপত্তা, রাষ্ট্রীয় খাদ্য সার্বভৌমত্ব এবং গণমানুষের কল্যাণে খাদ্য সরবরাহ–এসব ধারণার জায়গা দখল করে নিয়েছে এক বৈশ্বিক কর্পোরেট খাদ্য ব্যবস্থা বা গ্লোবাল কর্পোরেট ফুড রেজিম"।[৩]

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রায় শতকরা ৬৫ ভাগ আসে কৃষি থেকে এবং মাত্র ১০টি বহুজাতিক 'এগ্রোকেমিক্যাল' প্রতিষ্ঠান বৈশ্বিক কৃষি ব্যবসার প্রায় ৮১ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়াও উল্লেখ্য, গোটা বিশ্বের সামগ্রিক বীজ বাজারের প্রায় ৬৪ শতাংশ দখল করে রেখেছে মাত্র ১০টি বহুজাতিক কোম্পানি।

নতুন প্রযুক্তি মাত্রই নতুন সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যম তা নয়, বরং এই প্রযুক্তি সম্পদ লুণ্ঠনের হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহার করা হতে পারে, যদি এই প্রযুক্তির সাথে সংযুক্ত হয় আইনি আধিপত্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ কয়েকটি দেশের দেশীয় পেটেন্ট আইন এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য সম্পর্কিত মেধাস্বত্ব অধিকার আইনের ভিত্তিতে প্রযুক্তি এখন আধিপত্যবাদী দেশগুলো কর্তৃক দুর্বল বা অনুন্নত দেশের প্রাকৃতিক সম্পদরাজি লুণ্ঠনের হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এ ধরনের পেটেন্ট আগ্রাসনের সুযোগ করে দিয়েছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ট্রিপস চুক্তির ২৭.৩(খ) ধারা। এই চুক্তির মাধ্যমে বহুজাতিক কোম্পানি কর্তৃক বিভিন্ন প্রকারের পণ্য ও প্রক্রিয়ার পেটেন্টকরণের সম্ভাবনা অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই চুক্তি এমনকি গ্লোবাল কর্পোরেশন কর্তৃক জেনেটিক সম্পদ যেমন বীজ জার্মপ্লাজম পেটেন্টের সুযোগ সৃষ্টি করেছে, ফলে কৃষকরা তাদের উদ্ভাবিত বীজের মালিকানা হারাচ্ছে। ট্রিপস চুক্তি অনুসারে জিনের পেটেন্ট দাবি করতে পারবে শুধু সরকার ও কর্পোরেশন; কৃষক এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এই পেটেন্ট দাবি করতে পারবে না এবং এই চুক্তিতে ঐতিহ্যবাহী লোকায়ত জ্ঞানের উপর কৃষক ও কমিউনিটির স্বাভাবিক প্রাকৃতিক অধিকারের স্বীকৃতিও নেই (গ্রিনফিল্ড, ১৯৯৯)।[৪]

পশ্চিমা বহুজাতিক কোম্পানি কর্তৃক প্রাণবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ দেশগুলোর জেনেটিক সম্পদরাজির এই লুণ্ঠনকে আমাদের মতো দেশের কর্মকর্তাগণ যে মেনে নিচ্ছেন তার পেছনে কাজ করে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ। ঐতিহাসিকভাবে পদানত সংস্কৃতির লোকায়ত জ্ঞান কাঠামো এবং প্রাকৃতিক/সাংস্কৃতিক সম্পদকে পণ্যে পরিণত করা হলে এর সাথে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা সংযুক্ত হয়ে তৈরি করে এই সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ। চলমান বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পশ্চিমা সংস্কৃতি আধিপত্যমূলক এবং সে সংস্কৃতিতে মালিকানা ও সম্পত্তি সম্পর্কিত যে ধারণা

তাদের আইন ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মাঝে প্রোথিত আছে তাকেই আমাদের এখানকার অনেক পণ্ডিত মেনে নিচ্ছেন। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার পেটেন্ট আইন যে মালিকানা সম্পর্ক উৎপাদন করে তা মেনে নেয়ার প্রবণতা তৃতীয় বিশ্বের অনেক শিক্ষিত অনুগতদের মাঝে পরিলক্ষিত হয়।

পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ তার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক স্বার্থে প্রাণ ও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার উপর যে পেটেন্ট আইন চাপিয়ে দিচ্ছে তাকেও জায়েজ মনে করছে এদেশের ঔপনিবেশিক এলিট প্রজন্ম! পশ্চিমের সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের আরেকটি বড় অনুষঙ্গ হচ্ছে প্রযুক্তির যে কোনো উদ্ভাবন/আবিষ্কারকেই আরাধনা করার মানসিকতা তৈরি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ মাত্রই প্রগতি এই বিজ্ঞান-ঢাকা কুসংস্কার অনেকের মাঝেই দেখা যায়। ফলে জেনেটিক ইঞ্জিরিয়ারিং/জিএম প্রযুক্তি মাত্রই মানবকল্যাণ সাধন করবে–এই অন্ধ ধারণার কারণে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো জিএমের মাধ্যমে সহজেই বায়োপাইরেসির মধ্য দিয়ে আমাদের মতো দেশের শস্যবীজের মালিকানা ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হচ্ছে।

বহুজাতিক এগ্রো কেমিক্যাল কর্পোরেশনগুলো অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে জিএম টেকনোলজি গ্রহণ করার কারণ হচ্ছে, এর মাধ্যমে সহজেই পেটেন্ট আগ্রাসনের মাধ্যমে কৃষিবীজের ওপর কোম্পানির মনোপলি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সাথে রাজনৈতিক অর্থনীতির সম্পর্ক যাঁরা মালিকানার সম্পর্ককে বাদ দিয়ে বিবেচনা করেন, তাঁরা নিজের অজান্তেই বহুজাতিক কোম্পানির কাছে স্বদেশের সম্পদের মালিকানা তুলে দেয়ার এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন। জিএম দিয়ে পেটেন্ট আগ্রাসন চালিয়ে কোম্পানি যখন বায়োপাইরেসি করে আর এর মাধ্যমে আমাদের হাজার হাজার বছরের শস্যবীজের মালিকানা দাবি করে, তখন তাকে আর নির্মোহ বিজ্ঞান বলা যায় না; এটা কর্পোরেটের হাতিয়ার হিসেবেই কাজ করে। বাংলাদেশ এখন বহুজাতিক এগ্রো কর্পোরেশনের জিএম বাণিজ্যের উর্বর ভূমিতে পরিণত হচ্ছে। জেনেটিক্যালি মডিফায়েড বিটি বেগুন চাষের প্রক্রিয়া শুরু করার পর বাংলাদেশে জিএম আলু, জিএম গোল্ডেন রাইস ও জিএম বিটি তুলার (সম্প্রতি ভারতের কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্র রাজ্য সরকার এই তুলার চাষ নিষিদ্ধ করেছে) বাজারজাতকরণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মনসান্টো সিনজেন্টার মতো বহুজাতিক কোম্পানি। এসব জিএম প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের লোকায়ত জ্ঞান, বীজসম্পদসহ সামগ্রিক কৃষিব্যবস্থা বহুজাতিক কোম্পানির কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণে চলে যাবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। জিএম তুলা কৃষক পর্যায়ে ছাড়ের অনুমোদন লাভের জন্য তুলা উন্নয়ন বোর্ড কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের কাছে আবেদন জানিয়েছে (নিউ এজ, ২৪ মার্চ ২০১৪)। জিএম গোল্ডেন রাইস বাজারজাতকরণের সব আয়োজন সম্পন্ন। এছাড়া চলছে জিএম আলুর ফিল্ড ট্রায়াল–আগামী বছর জিএম আলু কৃষক পর্যায়ে ছাড়ের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট! এভাবে একে একে কৃষিতে বীজ আগ্রাসন আমাদের হাজার বছরের বীজবৈচিত্র্যকে হুমকির মুখে ফেলে দেবে।

এসব জিএম প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের লোকায়ত জ্ঞান, বীজসম্পদসহ সামগ্রিক কৃষিব্যবস্থা বহুজাতিক কোম্পানির কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণে চলে যাবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

১. জিএম বিটি বেগুন : পর্যাপ্ত পরীক্ষা না করে বিটি বেগুন বীজ বাজারজাতকরণ বিপজ্জনক

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের নিজস্ব নয়টি বেগুনের জাতকে জেনেটিক্যালি পরিবর্তিত করে এসব জাতের মালিকানা নিয়ে নিয়েছে মার্কিন এগ্রো কর্পোরেশন মনসান্টো এবং তার ভারতীয় অংশীদার মাহিকো নামের দুটি বহুজাতিক কোম্পানি। শুধু তা-ই নয়, পর্যাপ্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে ইতোমধ্যেই এই জিএম বিটি বেগুনের চাষাবাদ শুরু করেছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)। শুধু মাটি, পাখি-পতঙ্গ, জীবজন্তু নয়; এটা জনস্বাস্থ্যের জন্যও বিপজ্জনক বলে অনেকেই মত দিয়েছেন। এই বেগুনবীজের বাজারজাতকরণ ভারত ও ফিলিপাইনে নিষিদ্ধ হলেও বাংলাদেশের জমিন ও গণমানুষকে 'গিনিপিগ' বানিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে এই বেগুনের চাষাবাদ হচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞ মহল আশঙ্কা প্রকাশ করছেন।

এই বেগুনে মাটিতে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়ার টক্সিন (বিটি) জিন ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েনসিস সংযুক্ত করায় এর দীর্ঘমেয়াদি বিষক্রিয়া পরীক্ষা (Chronic Toxicity Testing) সম্পন্ন করা আবশ্যক। কিন্তু ভারতে মাহিকো কোম্পানি ইঁদুরের উপর শুধুমাত্র ৯০ দিনের জন্য ভারতীয় বেগুন জাতের বিষক্রিয়া পরীক্ষা সম্পন্ন করে। আবার যথাযথ প্রোটোকল অনুসরণ করে সম্পাদন করা হয়নি বলে বেশ কয়েকজন বায়োটেক বিশেষজ্ঞ এই পরীক্ষাকে অগ্রহণযোগ্য বলে মত দিয়েছেন। উল্লেখ্য, ভারতের আদালতই এই বেগুনের পরীক্ষার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। যদিও কোম্পানি জালিয়াতি করে রিপোর্ট দেয় যে তাতে ক্ষতি হবে না।

বলা বাহুল্য, প্রজনন বিষক্রিয়া পরীক্ষাসহ দীর্ঘমেয়াদি বিষক্রিয়া পরীক্ষা না করে এই বেগুন কৃষক পর্যায়ে ছেড়ে দেয়া জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। বিটি টক্সিনের বিরূপ স্বাস্থ্যগত সমস্যা (প্রদাহ, অ্যালার্জি, প্রজনন স্বাস্থ্য, অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স ইত্যাদি) নিয়ে দুনিয়াব্যাপী বিজ্ঞানীদের মাঝেই মতবিরোধ রয়েছে। এ রকম ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়ে পর্যাপ্ত পরীক্ষা না করে বীজ বাজারজাতকরণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

বাংলাদেশের বেগুন বীজের মালিকানা চলে যাচ্ছে বহুজাতিক কোম্পানির কাছে

বিটি বেগুনের মালিকানা আত্মসাৎ করে বাংলাদেশের ৯টি বেগুনের জাতের মেধাস্বত্ব এবং বাণিজ্যিক স্বত্ব যখন বহুজাতিক কোম্পানি মনসান্টো-মাহিকো দখল করে নিল, তখন এদেশের বহুজাতিক কোম্পানির সহযোগীরা এই বীজের মালিকানা বাংলাদেশেরই থাকবে বলে মিথ্যাচার করে বেড়াচ্ছে। বারির পক্ষ থেকে বীজের মালিকানা বাংলাদেশেরই থাকবে বলে প্রচারণা চালানোর পর, সাদ হাম্মাদি নামক এক সাংবাদিক গার্ডিয়ানে একই মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে দাবি করেছেন, এই বীজের মালিকানা মনসান্টোর নয় এবং এক্ষেত্রে বাংলাদেশের কৃষকদের কোনো রয়্যালটি ফি অথবা টেকনোলজি ফি দিতে হবে না! সাদ হাম্মাদি লিখেছেন, "The BT gene was developed by the Maharashtra Hybrid Seed Company, the Indian partner of the US seed giant

Monsanto and later donated to the public sector partners in India, Bangladesh and Philippines. BT brinjal was developed by the government-operated Bangladesh Agricultural Research Institute with technical assistance from Cornell University in the US and funding from USAid. Monsanto has no ownership rights over the technology and because it has been developed by a public institution there are no technology fees or royalties payable on the crop by any farmer in Bangladesh. Hence, farmers will be encouraged to save seeds and use them in future."
http://www.theguardian.com/environment/2014/jun/05/gm-crop-bangladesh-bt-brinjal

বারি এবং সাদ হাম্মাদির দাবি যে অসার তা প্রমাণের জন্য বিটি বেগুন চুক্তিনামাই যথেষ্ট। বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট ক্ষমতায় থাকার সময় ২০০৫ সালের ১৪ মার্চ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি), মার্কিন বহুজাতিক বীজ কোম্পানি মনসান্টোর পক্ষে ভারতীয় কোম্পানি মহারাষ্ট্র হাইব্রিড সিড কোম্পানি লিমিটেড (মাহিকো) ও ভারতীয় কোম্পানি সাতগুরু ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্ট প্রাইভেট লিমিটেডের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় যে সাব-লাইসেন্স চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তাতে সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে যে বিটি বেগুনের বীজের মেধাস্বত্ব মনসান্টো-মাহিকো কোম্পানির (ধারা ১.১৯) এবং তা বাংলাদেশের বারিকে কিনে নিতে হবে কোম্পানি থেকেই (ধারা ১.৬)।

1.19 "Monsanto/MHSCL IP Rights" shall mean all intellectual property rights that Monsanto or MHSCL owns or controls which will be infringed by making, using or selling Licensed Domestic Eggplant Products containing MHSCL Technology or Monsanto Technology (i.e. the BT Gene).

Article 1.6: It is expressly understood by Sub-licensee (BARI) that this sublicense is granted solely for the distribution of `Licensed Domestic Eggplant products' (i.e. BT seeds) at Cost (defined in article 1.6 and elaborated in Annexure 2)

বিটি প্রযুক্তি এবং এর মালিকানা বিষয়ে সাদ হাম্মাদির অজ্ঞতা প্রকাশ পায় নিচের বক্তব্যে : "Monsanto has no ownership rights over the technology and because it has been developed by a public institution there are no technology fees or royalties payable on the crop by any farmer in Bangladesh."

আগেই দেখানো হয়েছে, চুক্তির ধারা অনুযায়ী বিটি প্রযুক্তি এবং বিটি বেগুনের মালিকানা বহুজাতিক কোম্পানির এবং তার জন্য রয়্যালটি ফি, টেকনোলজি ফি অবশ্যই দিতে হবে। সাংবাদিক সাদ কি চুক্তি পড়ে দেখার ফুরসত পাননি? বাংলাদেশের বেশ কয়েকটা পত্রিকায় (ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ইউএনবি, ডেইলি সান, দৈনিক সকালের খবর) এই চুক্তি নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট হয়েছে, তা-ও কি চোখে পড়েনি তাঁর? চুক্তির ধারা ৯.২ (গ)-এ বলা হয়েছে, This Agreement may be terminated by Sub licensor (read MHSCL) if in Sub licensors judgment, reasonably exercised, laws and regulations in the Territory (read Bangladesh) do not provide adequate assurance of protection for commercial and intellectual property rights, including, but not limited to: i) effective, legal and practical protection of Licensed Domestic Eggplant Products, the B.t. Gene and/or MHSCL Technology against unauthorized reproduction; and ii) implementation in the Territory of legislation affording protection for patented technology incorporated in living organisms.

৪৮ নম্বর ধারায় এই রকম আউটসোর্সিংকে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। মধ্যবর্তী কোনো এজেন্টের মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগ, যা শ্রম আইনের কোনো অধিকার থেকে শ্রমিককে বঞ্চিত করতে পারে বা শ্রম আইনের কোনো বাধ্যবাধকতা থেকে চাকরিদাতা তথা মালিক এড়িয়ে যেতে পারে তা এই ধারা অনুযায়ী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অর্থাৎ বিটি বেগুন বীজ ও প্রযুক্তির বাণিজ্যিক ও মেধাস্বত্ব অধিকারের সংরক্ষণ লঙ্ঘিত হলে কোম্পানি এ চুক্তি বাতিলের অধিকার রাখে! চুক্তির এসব ধারা অনুযায়ী প্রমাণিত হচ্ছে, বাংলাদেশের বেগুনবীজের মালিকানা চলে যাবে মার্কিন-ভারতীয় কোম্পানি মনসান্টো-মাহিকোর কাছেই। এটা বায়োপাইরেসি ছাড়া আর কিছুই নয়।

গেটকো এগ্রো ভিশন লিমিটেড এবং সুপ্রিম সিড কোম্পানি লিমিটেড এরই মধ্যে বিটি বেগুন বীজ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের জন্য আবেদন করে রেখেছে বারির কাছে। দেশি-বিদেশি কোম্পানির মুনাফা লাভের বলি হবে এ দেশের নিজস্ব বেগুন জাত। আবার কৃষিমন্ত্রী নিজেই কৃষকদের মাঝে বিটি বেগুনের চারা বিতরণ অনুষ্ঠানে দেয়া ভাষণে বলেছেন, 'বুদ্ধিবৃত্তিক অধিকার, বাণিজ্য-সংক্রান্ত অধিকার, পেটেন্ট ইত্যাদিসহ বিদ্যমান এবং অনাগত অন্য অনেক বিধি-বিধান মেনেই জিএম ফসলের বাস্তবতাকে মানবকল্যাণে ব্যবহার করতে হবে।' অর্থাৎ জিএম ফসলের পেটেন্ট, বাণিজ্য, মালিকানা–সবই বহুজাতিক এগ্রো কর্পোরেশনের হাতে থাকবে। এর মানে বাংলাদেশের ফসল ও সবজির ওপর কোম্পানির একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশের হাজার বছরের নিজস্ব কৃষিজ সম্পদের ওপর বহুজাতিক কোম্পানির এ আগ্রাসন দেশের কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তাকে যে হুমকির মুখে ঠেলে দেবে, তা মন্ত্রীর কথায়ই স্পষ্ট। এতে মানবকল্যাণ না হয়ে বহুজাতিক এগ্রো কর্পোরেশনেরই কল্যাণ হবে।

এছাড়া সাব-লাইসেন্স চুক্তির ৯.৬ ধারা থেকে বোঝা যায়, এই বীজের বিতরণ ও সংরক্ষণ কঠোরভাবেই বহুজাতিক এগ্রো কর্পোরেশন ও তাদের দেশীয় এজেন্সিগুলোর নিয়ন্ত্রণে থাকবে। চুক্তি অনুযায়ী এই চুক্তি বাতিলের সঙ্গে সঙ্গে বারিকে বাংলাদেশে এই বিটি বেগুন বীজ বিতরণ বন্ধ করতে হবে এবং সব বীজ ধ্বংস করে ফেলতে হবে। এমনকি বারিকে কোম্পানির প্রতিনিধির সামনে জিএম বেগুনের সকল জার্মপ্লাজম (Germplasm: A collection of genetic sources for example seed collections) ধ্বংস করে এ ব্যাপারে

লিখিতভাবে কোম্পানির কাছে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

বিটি বেগুন বীজের মেধাস্বত্ব অধিকার কোম্পানির বলে স্বীকৃতি দেয়ায় এ চুক্তি তাই ডব্লিউটিও থেকে বাংলাদেশের পাওয়া সুবিধারও সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং তাই অবৈধ। এসব গণবিরোধী চুক্তি বাংলাদেশের হাজার বছরের লোকায়ত জ্ঞান, বীজসম্পদসহ সামগ্রিক কৃষিব্যবস্থাকে বহুজাতিক কোম্পানির কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যাবে। বাংলাদেশে গোল্ডেন রাইস প্রবর্তনের জন্য বহুজাতিক কোম্পানি সিনজেন্টা এবং বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মধ্যেও একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জিএম আলুর জন্যও চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এসব চুক্তিতেও বাণিজ্যিক ও মেধাস্বত্ব অধিকার কোম্পানির বলেই বিশেষজ্ঞরা ভাবছেন। সংবিধানের ১৪৫(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রতিটি আন্তর্জাতিক চুক্তি সংসদে তুলতে বাধ্যবাধকতা আছে। বলা আছে, জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত হলে সংসদের গোপন বৈঠকে উত্থাপন করতে হবে। জিএম শস্য নিয়ে ২০০৫ সালে করা চুক্তি তৎকালীন বিএনপি সরকার সংসদে আলোচনা করেছে বলে আমাদের জানা নেই। এসব চুক্তি সংসদে আলোচনা না করে, দেশের বিশেষজ্ঞ ও নাগরিক সমাজের সঙ্গে পরামর্শ না করে গোপনে স্বাক্ষর করার মাজেজা কী? নাকি এক্ষেত্রে সংবিধান লঙ্ঘন হলেও বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থে তা জায়েজ!

বীজ নিরাপত্তা ও খাদ্য নিরাপত্তা চলে যাবে বহুজাতিক কোম্পানির হাতে

প্রথমত, মার্কিন ও ভারতীয় কোম্পানি মনসান্টো ও মাহিকোর এই পেটেন্ট আগ্রাসন এবং বিটি বেগুনের বাণিজ্যিক ব্যবহার আমাদের দেশীয় বেগুনের জেনেটিক বৈচিত্র্যকে হুমকির মুখে ফেলে দেবে। উল্লেখ্য, সারাদেশের ২০ জন বিটি বেগুন চাষির মধ্যে সকলেই ইতোমধ্যে জানিয়েছেন, বারির পক্ষ থেকে তাঁদের জানানো হয়েছে যে, তাঁরা বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারবেন না।

ধারণা করা যায়, সরকারের পক্ষ থেকে অধিক ফলনের বিজ্ঞাপন দিয়ে বিটি বেগুন চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করা হলে শুধুমাত্র জিএম বীজের চাষাবাদেই কৃষক নিয়োজিত থাকবে। কোম্পানির পেটেন্টকৃত বিটি বেগুনের চাষাবাদ ঐতিহ্যবাহী লোকায়ত জাতগুলোর জায়গা দখল করে নিলে দেশি বীজের সংরক্ষণ ও পুনরুৎপাদনের ধারাবাহিক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এতে করে বিভিন্ন প্রজাতির বেগুনবীজ হারিয়ে যেতে পারে। ফলে বেগুনের মতো একটি জনপ্রিয় সবজির বীজ নিরাপত্তা চলে যাবে বহুজাতিক কোম্পানির হাতে। দ্বিতীয়ত, পরাগায়ণের মাধ্যমে জিনটি স্থানীয় অন্য জাতের বেগুনে প্রবেশ করলে এসব জাতও জেনেটিক দূষণের কবলে পড়বে এবং কোম্পানিও তার মালিকানা দাবি করতে পারবে। ফলে বাংলাদেশের নিজস্ব জাতের সব বেগুনের ওপর কোম্পানির মেধাস্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

আবার বিটি বেগুনের মধ্যে থাকা বিটি টক্সিনের প্রতি বেগুনের পোকা প্রতিরোধী হয়ে উঠতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ২০০৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিটি ভুট্টার বিটি টক্সিন প্রতিরোধী রুট ওয়ার্ম নামক পোকার সন্ধান পাওয়া যায়। ফলে বিটি ভুট্টা চাষের মূল লক্ষ্যই ভেস্তে যেতে পারে। মাহিকো কোম্পানির সঙ্গে বারির সাব-লাইসেন্স চুক্তির ৯.২(ই) ধারায়ও বলা হয়েছে, 'বারি এ চুক্তি বাতিল করতে পারবে, যদি পোকা এই বিটি বেগুনের প্রতি প্রতিরোধী হয়ে ওঠে।'

২. জিএম গোল্ডেন রাইসের মিথ

বাংলাদেশে বহুজাতিক এগ্রো কর্পোরেশনের বীজ রাজনীতির নতুন সংযোজন জেনেটিক্যালি মডিফায়েড (জিএম) ধান গোল্ডেন রাইস। গোল্ডেন রাইস প্রকল্পের সাথে মূলত জড়িত আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (IRRI), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI) এবং মার্কিন সংস্থা বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন। ভুট্টা অথবা ড্যাফোডিল ফুল থেকে নেয়া 'ফাইটোন সিনথেজ' জিন এবং মাটির এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া থেকে নেয়া 'ক্যারোটিন ডিস্যাচুরেজ' জিন ধানের জিনোমে প্রবেশ করিয়ে এই গোল্ডেন রাইস প্রস্তুত করা হয়। এই দুটি জিন ধানের এন্ডোস্পার্মে বিটা ক্যারোটিন (ভিটামিন এ'র পূর্বের অবস্থা) তৈরিতে কাজ করে। বাংলাদেশে গোল্ডেন রাইস প্রবর্তনের জন্য বহুজাতিক কোম্পানি সিনজেন্টা এবং বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর ভিত্তিতেই ব্রি বাংলাদেশের ব্রি-২৯ জাতের ধান সিনজেন্টা কোম্পানিকে দিয়েছে জেনেটিক্যালি মডিফাই করার জন্য। সিনজেন্টা ব্রি-২৯ জাতে উক্ত দুটি জিন ট্রান্সফার করে গোল্ডেন রাইস নামে বাজারজাত করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিগত বছর এপ্রিল মাসে দেশে গোল্ডেন রাইস গবেষণার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন পায় এবং এ বছর জানুয়ারি মাসে নির্দিষ্ট পরিসরে পরীক্ষামূলকভাবে গোল্ডেন রাইস চাষ করার জন্য পরিবেশ মন্ত্রণালয় ছাড়পত্র দেয়। এই ফিল্ড টেস্টিং সম্পন্ন করেই বাজারজাতকরণে যাবে কোম্পানি।

গোল্ডেন রাইস দিয়ে রাতকানা রোগ সারাতে চান, নিজেরাই কি রাতকানা?

এই রাইস দিয়ে বাংলাদেশ, ফিলিপাইনের রাতকানা রোগ সারানোর কথা বলে কোম্পানি। এটা নাকি তাদের মানবহিতৈষী কর্মের একটা নিদর্শন। কোম্পানির বয়ান হচ্ছে, এই রাইসে বিটা ক্যারোটিন উৎপাদনকারী জিন ট্রান্সফার করা হয়েছে, ফলে এই রাইস খেলেই অপুষ্টির শিকার গরিব মানুষ 'ভিটামিন এ'র অভাব দূর করে রাতকানা থেকে রক্ষা পাবে। কিন্তু কোম্পানির এই বয়ানের সাথে অনেক বিশেষজ্ঞই একমত নন। তাঁদের মতে, এই রাইস দিয়ে 'ভিটামিন এ'র ঘাটতি দূর করার প্রচার সঠিক নয়। ধান কেটে নেয়ার পর কতটা সময় এই পুষ্টি ধানে থাকে এবং রান্নার পরে কতখানি অবশিষ্ট থাকে তা নিয়ে অনেক সন্দেহ রয়েছে। রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই বিটা ক্যারোটিন সহজেই জারিত হয়। এই যৌগে অনেকগুলো কনজুগেটেড ডাবল বন্ডের (Conjugated double bond) কারণে তা আলো কিংবা অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ভেঙে যেতে পারে। ধান মাড়াইয়ের পর শুকিয়ে স্টোরেজ কন্ডিশনে রাখা হলে তা জারিত হয়ে যেতে পারে, ফলে ধানে ভিটামিন এ'র পরিমাণ অনেক লোয়ার লেভেলে চলে যাবে, অর্থাৎ তা রাতকানা রোগ সারাতে ব্যর্থ হবে। স্টোরেজ কন্ডিশনে রাখার পর গোল্ডেন রাইসে ভিটামিন এ'র লেভেল কতটুকু থাকবে তার পরীক্ষা ছাড়া এটা তাই বাজারে ছাড়া ঠিক হবে না। বাংলাদেশে ব্রি এই পরীক্ষা করেছে বলে আমাদের জানা নাই। গোল্ডেন রাইসের জৈবপ্রাপ্যতা (Bioavailability) নিয়ে কোম্পানি ২০১২ সালে যে পরীক্ষা করে তাতে ক্যারোটিনয়েডের সহজেই জারিত হওয়ার এই প্রবণতা মাথায় রেখে গোল্ডেন রাইস উৎপাদনের সাথে সাথেই তাকে মাইনাস ৭০

ডিগ্রি সেলসিয়াসে সংরক্ষিত করা হয় এবং তারপর শিশুদের খাওয়ানো হয়। ফলে এই রেজাল্ট গ্রহণযোগ্য নয় (সূত্র : Golden Rice Myths, Michael Hansen)। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় স্টোরেজ কন্ডিশনে এই গোল্ডেন রাইসের Bioavailability টেস্ট না করার মাজেজা কী? এটা একটা বায়াসড টেস্ট, এই টেস্টের উপর ভিত্তি করে যে দাবি করা হচ্ছে এই রাইস রাতকানা দূর করবে, তাতে আস্থা রাখার সুযোগ কই?

আবার বিটা ক্যারোটিন হাইড্রোফোবিক বলে শরীরে তার অভিশোষণের (Absorption) জন্য ডায়েটে পর্যাপ্ত পরিমাণ ফ্যাট দরকার, ফ্যাট ছাড়া এর অভিশোষণ হবে না, মানে রক্তে পৌঁছতে পারবে না। সমস্যা হচ্ছে, এশিয়ার যেসব দেশে অপুষ্টির কারণে রাতকানা রোগ হচ্ছে, সেসব দেশের গরিব লোকদের খাদ্যে ফ্যাট/লিপিডের পরিমাণ খুব নগণ্য, কেননা দরিদ্র জনগোষ্ঠী সুষম খাবার থেকে বঞ্চিত। ফলে এদের গোল্ডেন রাইস খাওয়ালেও ফ্যাটের অভাবে শরীরে ভিটামিন এ'র জৈবপ্রাপ্যতা (Bioavailability) খুব কম হবে, ফলে রাতকানা রোগ সারার প্রকল্প ভেস্তে যেতে পারে। ভিটামিন এ'র অভাবকে আলাদাভাবে দেখার সুযোগ নেই, এটা মূলত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সুষম খাবারের অভাবেরই প্রতিক্রিয়া। এইসব জিনিস মাথায় রেখেই জার্মানিতে ২০১২ সালে গোল্ডেন রাইসের জৈবপ্রাপ্যতা পরীক্ষায় ভলান্টিয়ারদের ৬৫-৯৮ গ্রাম রাইসের সাথে ১০ গ্রাম বাটার দেয়া হয় (সূত্র : Golden Rice Myths; Michael Hansen)। এই বাটার দেয়ার কারণেই রক্তে বিটা ক্যারোটিনের উপস্থিতি ভালো পাওয়া যায়। কিন্তু এশিয়ার অপুষ্টিতে আক্রান্ত গরিব মানুষ ভাতের সাথে ১০% মাখন পাবে কই? ফলে এই টেস্টও গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ কোম্পানি ভিটামিন এ'র জৈবপ্রাপ্যতা বাড়ানোর তাগিদেই খাবারের সাথে ফ্যাট দিয়ে দিয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে গোল্ডেন রাইস থেকে প্রাপ্য ভিটামিন এ'র কতটুকু শরীরের রক্তে প্রবেশ করবে তা জানার জন্য ফ্যাট ছাড়াই বিটা ক্যারোটিনের জৈবপ্রাপ্যতা স্টাডি করতে হবে।

বীজ মালিকানার প্রশ্ন, এদেশের ধানবীজের উপর বহুজাতিক কোম্পানির পেটেন্ট আগ্রাসনের প্রশ্ন বাদ দিলেও প্রোটোকল অনুযায়ী গোল্ডেন রাইসের ভিটামিন এ'র জৈবপ্রাপ্যতা টেস্ট না করে এটা বাজারজাতকরণের যে কোনো চেষ্টা হবে চরম ভুল পদক্ষেপ। বাংলাদেশে এই গোল্ডেন রাইসের চাষাবাদের জন্য ব্রি তোড়জোড় করছে। কিন্তু এসব পরীক্ষার ব্যাপারে তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। গোল্ডেন রাইস দিয়ে যাঁরা রাতকানা রোগ সারানোর কথা বলেন তাঁরা নিজেরাই এই রাইস বিষয়ক গবেষণায় রাতকানা হয়ে আছেন!

গোল্ডেন রাইস ছাড়াই ভিটামিন এ'র ঘাটতি দূর করা সম্ভব

গোল্ডেন রাইস ছাড়াই ভিটামিন এ'র ঘাটতি দূর করা সম্ভব বলে অনেকেই মত দিয়েছেন। পরিবেশ চিন্তাবিদ বন্দনা শিবার মতে, সহজপ্রাপ্য ভিটামিন এ'র সোর্সগুলো (শাকসবজি ইত্যাদি) গোল্ডেন রাইসের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর। বীজবিজ্ঞানী ড. এম এ সোবহান বলেন, "ভিটামিন এ'র ঘাটতি পূরণের জন্য দেশে জিএম গোল্ডেন রাইসের প্রচলন করার চেষ্টা করছে।...দেশের গাজর, মিষ্টিকুমড়া, মিষ্টি আলু, শিম, ঢেঁড়স, পুঁইশাক, ডাঁটাশাকে পর্যাপ্ত ভিটামিন এ রয়েছে। ফলের মধ্যে পেঁপে, বাঙ্গি, কাঁঠাল, আম, কলা, আনারসের মধ্যে ভিটামিন এ রয়েছে। এছাড়াও ঢেঁকিছাঁটা চালের মধ্যে ভিটামিন এ পর্যাপ্ত রয়েছে। তারপরও কৃষককে বীজ কোম্পানি-নির্ভর করতে এ ধরনের গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।" বৈচিত্র্যময় খাবার, মানে ব্যালান্সড ডায়েট ছাড়া অপুষ্টি দূর করা যাবে না। কিন্তু শুধুমাত্র গোল্ডেন রাইসের মাধ্যমে অপুষ্টি দূর করার প্রোপাগান্ডা চালিয়ে কোম্পানি কেবল তার বীজ বাণিজ্যকেই ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছে। ২০০০ সালের পর থেকেই এশিয়ায় ভিটামিন এ সাপ্লিমেন্টেশন (Supplementation) এবং ফুড ফোর্টিফিকেশন (Food fortification)-এর কারণে ফিলিপাইন ও বাংলাদেশে ভিটামিন এ'র ঘাটতি অনেক কমে এসেছে। ইউনিসেফের রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশ ৯০ শতাংশের উপরে শিশুদেরকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর কর্মসূচির আওতায় নিয়ে এসেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গোল্ডেন রাইস ছাড়াই বাংলাদেশ ভিটামিন এ ঘাটতি পূরণে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে এবং এই সাফল্য ধারাবাহিক। ফলে গোল্ডেন রাইসের প্রয়োজন খুব আছে কি না তা ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে, যেখানে এই ধানের বাজারজাতকরণ দেশে বহুজাতিক কোম্পানির বীজ আগ্রাসনকে ত্বরান্বিত করবে?

ইউনিসেফের রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশ ৯০ শতাংশের উপরে শিশুদেরকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর কর্মসূচির আওতায় নিয়ে এসেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গোল্ডেন রাইস ছাড়াই বাংলাদেশ ভিটামিন এ ঘাটতি পূরণে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে এবং এই সাফল্য ধারাবাহিক।

গোল্ডেন রাইস: বহুজাতিক কোম্পানির কৃষি বাণিজ্যের নতুন হাতিয়ার

২০০০ সালের ২৯ জুন মার্কিন কংগ্রেসে অনুষ্ঠিত এক গণশুনানিতে সিনজেন্টা এবং এক ওয়ার্কশপে মনসান্টো কোম্পানি বলেছে, তারা গোল্ডেন রাইসের বিকাশের জন্য রয়্যালটি ফ্রি লাইসেন্স দেবে। এসব বহুজাতিক কোম্পানি কিন্তু গোল্ডেন রাইসের উপর তাদের মূল পেটেন্ট/ মেধাস্বত্ব দাবি পরিত্যাগ করেনি, বরং তারা শুধুমাত্র গোল্ডেন রাইসের আরো উন্নত জাত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে পাবলিক সেক্টরের বিজ্ঞানীদের রয়্যালটি ফ্রি লাইসেন্স দিতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছে।

গোল্ডেন রাইস মূলত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বহুজাতিক কোম্পানির এগ্রি বিজনেসের নতুন হাতিয়ার হিসেবেই কাজ করবে। এই রাইস মূলত মানবতাবাদের আড়ালে বহুজাতিক এগ্রো কর্পোরেশনের পাবলিক ইমেজ বৃদ্ধির বিজ্ঞাপনী কৌশল, যা বীজ রাজনীতিকে বৈধতা দেয়ার অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। ফলে কোম্পানির এই কৌশলী মানবতাবাদী প্রকল্পকে মহতী মনে করার কোনো কারণ দেখি না।

এই গোল্ডেন রাইস বাজারজাত করা হলে বাংলাদেশ তার নিজস্ব ধান ব্রি-২৯ এর মালিকানা হারাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এমনিতেই বহুজাতিক কোম্পানির পেটেন্ট আগ্রাসনে বাংলাদেশ প্রচুর ধানের জাতের মালিকানা হারিয়েছে। এখন আবার দেশের জনপ্রিয় ধান ব্রি-২৯ জাতের পেটেন্ট কোম্পানির করায়ত্তে চলে গেলে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা এবং খাদ্য সার্বভৌমত্ব আরো বেশি হুমকির মুখে পড়বে। আবার জিএম

শস্য বলেই এই ধানের রেণু ছড়িয়ে পড়ে অন্য জাতের ধান ও গাছপালার উপর কোলিক প্রভাব পড়বে, যা অন্য প্রজাতির ধান বা ফসলের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করে ফেলতে পারে। এই জিনগত বিশৃঙ্খলা দেশের প্রাণ ও প্রতিবেশের জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। ফলে জিএম গোল্ডেন রাইসের জৈব নিরাপত্তা টেস্ট করা অপরিহার্য।

৩. বিটি তুলা

জেনেটিক্যালি মডিফায়েড বিটি বেগুন চাষের প্রক্রিয়া শুরু করার পর এবার নতুন করে জিএম বিটি কটনের চাষ অনুমোদন করতে যাচ্ছেন কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী! এক্ষেত্রেও শোনানো হচ্ছে উৎপাদন বৃদ্ধির গল্প। এই জিএম তুলা কৃষক পর্যায়ে ছাড়ের অনুমোদন লাভের জন্য তুলা উন্নয়ন বোর্ড কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের কাছে আবেদন জানিয়েছে (নিউ এজ, ২৪ মার্চ ২০১৪)। জাতীয় জৈব নিরাপত্তা কমিটি ছাড়পত্র দিলেই সীমিত পর্যায়ে বিটি কটনের ফিল্ড ট্রায়াল শুরু হবে। যেখানে বিটি তুলার চাষ করতে গিয়ে ব্যাপক লোকসানের মুখে পড়ে ভারতে শত শত কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে এবং তারপর খোদ ভারতের রাজ্য সরকার এই বিটি তুলা নিষিদ্ধ করেছে, সেখানে বাংলাদেশে এই বিটি তুলার চাষের চক্রান্ত কেন করছেন এদেশের 'দেশপ্রেমিক' মন্ত্রীরা?

বিটি তুলার চাষ করতে গিয়ে ভয়াবহ ফলন বিপর্যয়ের মুখে পড়ে ভারতের কৃষকরা

মনসান্টো-মাহিকোর বীজ কিনে বিটি তুলার চাষ করতে গিয়ে ভয়াবহ ফলন বিপর্যয়ের মুখে পড়ে ভারতের কৃষকরা। অর্থাৎ কোম্পানির দাবির বিপরীতে ভারতের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, বিটি তুলার ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ বাড়বে। ভারতে হাজার হাজার একর তুলার ফলন নষ্ট হয়েছে। চড়া দামে কোম্পানি থেকে ভারতীয় কৃষকরা বিটি তুলার বীজ কিনতে বাধ্য হয়েছে। ফলন বৃদ্ধি দূরের কথা, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটক রাজ্যের হাজার হাজার একর তুলায় ব্যাপক পোকার আক্রমণ হয়। যেখানে পোকার আক্রমণ দূর করার জন্যই বিটি টক্সিন ব্যাবহার করা হয়েছে, সেখানে উল্টা পোকার আক্রমণ বৃদ্ধি কৃষকদের হতাশ করে। পরে গবেষণায় দেখা যায়, গুজরাট, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্রসহ বিভিন্ন জায়গায় পোকা বিটি কটনের প্রতিই প্রতিরোধী হয়ে ওঠে। এই পেস্ট রেজিস্ট্যান্সের ফলে বিটি টক্সিন কার্যকারিতা হারায় এবং পোকার আক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় কৃষকদের আরো অধিক পরিমাণ কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়।

ভারতের কেন্দ্র সরকার, মাহিকো কোম্পানি এবং কৃষিবিজ্ঞানীদের দ্বারা পরিচালিত সরেজমিন গবেষণায় জানা যায়, শুধু কর্ণাটক রাজ্যেই ৫৪ হাজার হেক্টর তুলা নষ্ট হয়, যার আর্থিক মূল্য ২৩০ কোটি রুপি। এই বিপুল ফসল নষ্ট হওয়ায় কর্ণাটক রাজ্য সরকার বিটি তুলার বীজের বাণিজ্য নিষিদ্ধ করে। এমনকি রাজ্য সরকার মাহিকো কোম্পানিকে কালো তালিকাভুক্ত করে ঐ রাজ্যের কৃষিতে যে কোনো ধরনের বিটি টেকনোলজির বাজারজাতকরণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে (দৈনিক ব্যাঙ্গালোর মিরর, ২২ মার্চ ২০১৪; বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ৩০ মার্চ ২০১৪)। মনসান্টো-মাহিকোর বিটি কটন বীজকে তাই অনেকে সুইসাইড বীজ বলেও অভিহিত করেন। বাংলাদেশের কৃষিতে এই আত্মঘাতী বীজ আমরা দেখতে চাই না!

ম্যানিপুলেটেড ডাটা আর গল্প শুনিয়ে আমাদের কর্পোরেট আগ্রাসনের শিকারে পরিণত করা হয়

বাংলাদেশে বিটি তুলা চাষের জন্য এখানকার বিজ্ঞানী/কৃষিবিদদের সম্মতি আদায়ের জন্য কিছুদিন আগে (২৭ ফেরুয়ারি ২০১৪) বহুজাতিক এগ্রো কর্পোরেশনগুলোর প্রমোটার ISAAA বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বার্ক) অডিটোরিয়ামে আয়োজন করে এক সেমিনারের। যেখানে বিটি তুলার চাষ করতে গিয়ে ব্যাপক লোকসানের মুখে পড়ে ভারতে শত শত কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে, সেখানে এই সেমিনারে ভাগীরথ নামক এক ভারতীয় 'বিশেষজ্ঞ' আমাদের শোনালেন ভারত বিটি কটন চাষ করে কিভাবে লাভবান হয়েছে। একবারের জন্যও বললেন না ভারতে পোকার প্রতিরোধী হয়ে ওঠার কাহিনি। বিটি কটনের ফলন বিপর্যয়ের গল্পও তাঁর বক্তৃতায় পাওয়া গেল না। জিএম শস্য যে বহুজাতিকের বায়োপাইরেসির হাতিয়ার, পেটেন্ট আগ্রাসনের মাধ্যমে যে বীজ মালিকানা কোম্পানির দখলে যায় তা ভাগীরথ সাহেবরা আলাপ করতেও ভুলে যান। এভাবেই ম্যানিপুলেটেড ডাটা আর গল্প শুনিয়ে আমাদের কর্পোরেট আগ্রাসনের শিকারে পরিণত করা হয়। বাংলাদেশের কৃষি আর এদেশের বীজের উপর একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রচার-প্রোপাগান্ডায় নেমেছেন ISAAA এর ভাড়াটে জ্ঞানবাগীশরা।

বিটি কটনে কী হবে?

১. বিটি তুলার পেটেন্ট মনসান্টোর, ফলে চড়া দামে এই বীজ কিনতে হবে কোম্পানির কাছ থেকে। এতে করে বীজ মালিকানা হারাবে কৃষক! ভারতের কৃষকদের মতো কোম্পানির নানা শর্তের ফাঁদে আটকা পড়লে তা কৃষকদের মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন করবে। এ বীজ স্থানীয় কৃষকদের পথে বসাবে বলে অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন।

২. ভারতের মতো এখানেও পেস্ট রেজিস্ট্যান্স দেখা দিলে এই বিটি তুলা চাষে ব্যাপক কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে, ফলে বিটি প্রযুক্তির কার্যকারিতা থাকবে না।

৩. ২০০৫ সালে এক গবেষণায় দেখা গেছে, বিটি কটন অ্যালার্জির জন্য দায়ী এবং ভারতে শত শত বিটি তুলা চাষি তুলা চাষ করতে গিয়ে মারাত্মক অ্যালার্জিতে আক্রান্ত হয়।

৪. পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের উপর বিটি কটনের সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে অনেক বিশেষজ্ঞ চিন্তিত। বিটি কটন জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকি সৃষ্টি করতে পারে।

আমরা মনে করি, এই বিটি তুলা কৃষি, কৃষক, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর। শুধুমাত্র কোম্পানির স্বার্থে এই তুলা চাষের অনুমোদন দেয়া যাবে না।

বহুজাতিক কোম্পানির জিএম আগ্রাসনে আমাদের ক্ষতিসমূহ

১. নিজেদের লোকায়ত জ্ঞান ও সম্পদের মালিকানা হাতছাড়া : পেটেন্ট আগ্রাসনের মাধ্যমে লোকায়ত জনগোষ্ঠী নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদের ও লোকায়ত জ্ঞানের মালিকানা হারায়।

২. খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন এবং খাদ্যের জন্য কর্পোরেটদের উপর নির্ভরশীলতা: বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ট্রিপস চুক্তি এবং এগ্রিমেন্ট অন এগ্রিকালচার পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে দরিদ্র দেশগুলোর লাখ লাখ কৃষকের জীবন-জীবিকা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তেমনি বহুজাতিক এগ্রো কর্পোরেশনের একচেটিয়া বাণিজ্যিক কর্তৃত্ব এবং মনোকালচারের কারণে এসব দেশের

প্রাণবৈচিত্র্য বিশেষ করে শস্যবৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়বে। বহুজাতিক কোম্পানির মনোপলি বিজনেস শস্যবীজের বৈচিত্র্যকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আগে সারা দুনিয়ার লাখ লাখ কৃষক নিজেদের শস্যবীজ নিজেরাই সংগ্রহ, সঞ্চয়, পুনরুৎপাদন করত, কিন্তু বর্তমানে মেধাস্বত্ব আইনের সুযোগ নিয়ে এসব বীজের মালিকানা বৃহৎ এগ্রো কর্পোরেশন নিজেদের করায়ত্তে নিয়ে আসায় কৃষকদের চড়া দামে পেটেন্টেড বীজ কিনে নিতে হচ্ছে। আবার বীজ ইঞ্জিনিয়ারিং ও বীজ মোডিফিকেশনের মাধ্যমে বীজের পেটেন্ট নিয়ে নিচ্ছে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো, ফলে সারা দুনিয়ার কৃষিতে চালু হয়েছে বীজ আগ্রাসন। ৫০ বছর আগেও ভারতের কৃষকরা প্রায় ৩০ হাজার জাতের ধানের চাষ করত, কিন্তু এখন মাত্র ১০টি জাত ৭৫% ধান উৎপাদন কাভার করে।

বহুজাতিক কোম্পানি কর্তৃক এভাবে পেটেন্ট আগ্রাসনের পরিপ্রেক্ষিতে, পেটেন্ট আইনের বাস্তবায়ন যখন শুরু হবে তখন আমাদের জীববৈচিত্র্য এবং কৃষিতে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। প্রথমত, বায়োপাইরেসির ফলে লোকায়ত জ্ঞানের প্রয়োগ এবং জেনেটিক সম্পদের ঐতিহ্যবাহী ব্যবহার বাধাগ্রস্ত বা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে। এসব উদ্ভিদ এবং শস্যবীজের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উৎপাদনের উপর বিধি-নিষেধের ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো খাদ্যশস্যের উপর গবেষণা করতে পারবে না এবং খাদ্য নিরাপত্তা চলে যাবে প্রাইভেট কর্পোরেশনের হাতে। স্বত্ব পাওয়া কোম্পানি এসব শস্যবীজ, উদ্ভিদ এবং ঔষধি গাছের সংরক্ষণ, উৎপাদন ও বিপণন বন্ধ করে দিতে পারবে। কৃষকদের নিজেদের জমিতে/খামারে বীজ সঞ্চয়, নবায়নকৃত ব্যবহার এবং বিক্রয় নিয়ন্ত্রিত হবে পেটেন্ট আইনের কারণে। ফলে পেটেন্টেড শস্যবীজ ও অন্যান্য জৈবিক সম্পদ উৎপাদনের জন্য হয় বহুজাতিক কোম্পানিকে রয়্যালটি দিতে হবে অথবা আমাদেরই উৎপাদন প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত এসব দ্রব্য উচ্চ দামে কোম্পানি থেকে কিনতে বাধ্য করা হবে। ফলে আমাদের মতো উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোতে কৃষিজ পণ্য ও খাদ্যদ্রব্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাবে, হুমকির মুখে পড়বে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা। আর এসব পেটেন্টেড পণ্যের একচেটিয়া ব্যবসা করে অবাধে মুনাফা অর্জন করবে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো।

৩. সাংস্কৃতিক ক্ষতি : এশিয়া ও আফ্রিকার জনপদের ঐতিহ্যবাহী কৃষি পদ্ধতির সাথে যুগপৎভাবে মিশে আছে এসব দেশের কৃষ্টি-কালচার-জীবনযাপনের বৈচিত্র্য। কৃষিতে কর্পোরেট আগ্রাসন তথা বায়োকলোনিয়ালিজম এই বৈচিত্র্যকে বিলুপ্ত করে দিচ্ছে বাণিজ্যিক আগ্রাসনের মাধ্যমে। এই আগ্রাসন বা কর্পোরেট এগ্রি বিজনেস কৃষির সাথে যে সংস্কৃতি ও জীবনযাপনের সম্পর্ক তা অস্বীকার করে এবং দুনিয়ার খাদ্য সমস্যা দূর করার নাম করে বীজ পেটেন্টিংয়ের মাধ্যমে চালু করে মনোকালচার (বিচিত্র খাদ্যশস্যের বদলে কোম্পানি তার বাণিজ্যিক স্বার্থে হাতে গোনা কিছু শস্য উৎপাদনে বাধ্য করে), যা কৃষির প্রাণবৈচিত্র্যকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। খাদ্য ও খাদ্য উৎপাদন কৃষকদের কাছে শুধু ভোগের বিষয় নয়, এর সাথে সংস্কৃতির অনুষঙ্গ রয়েছে। কিন্তু বহুজাতিক কোম্পানি কর্তৃক প্রাণ ও প্রতিবেশের বাণিজ্যিকীকরণ ও পণ্যকরণ লোকালয়ভিত্তিক কৃষির প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়।

আমরা মনে করি, বীজ নিরাপত্তা, খাদ্য নিরাপত্তা, বীজের মালিকানা–এসব প্রশ্ন বাদ দিয়ে জিএম প্রযুক্তির নির্বিচার প্রয়োগ আমাদের কৃষিতে বহুজাতিক কোম্পানির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে, যা দীর্ঘমেয়াদে বিভিন্নমুখী বিপদ তৈরি করবে। এই পেটেন্ট আগ্রাসন, এই বায়োপাইরেসি আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা আর প্রাণবৈচিত্র্য ধ্বংস করতে উদ্যত। এই আগ্রাসন থেকে আমাদের কৃষিকে রক্ষা করতে হবে। আমরা মনে করি, বহুজাতিক কোম্পানির সঙ্গে জিএম শস্য নিয়ে সম্পাদিত চুক্তির ফলে বাংলাদেশের ফসল ও সবজির ওপর কোম্পানির একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। অবিলম্বে এসব চুক্তি বাতিল করে দেশের কৃষিতে কর্পোরেট আগ্রাসন বন্ধ করতে হবে।

যোবায়ের আল মাহমুদ: সহকারী অধ্যাপক, ক্লিনিক্যাল ফার্মেসি অ্যান্ড ফার্মাকোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইমেইল: zalmahmud@du.ac.bd

তথ্যসূত্র :

১. Spivak, G. (2000). The New Subaltern: A Silent Interview. In: Chaturvedi, V. ed. Mapping subaltern studies and the postcolonial. London, Verso. pp. 324-340

২. McMichael, P. (1995). The new colonialism: Global regulation and the restructuring of the inter-state system. In D. Smith and J. Borocz (eds.), A New World Order? Global Transformations in the Late Twentieth Century (pp. 37–56). Westport: Greenwood Press.

৩. McMichael, P. (2000). The power of food. Agriculture and Human Values 17:21-33.

৪. Greenfield, G. (1999). The WTO, the world food system, and the politics of harmonised destructionÓ, www.labournet.org/discuss/global/wto.html.